৩.১ ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের অবক্ষয় ও অব-উপনিবেশীকরণ বা উপনিবেশবাদের অবসান (Decline of European imperialism and Decolonization or the end of Colonialism)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে ঠান্ডা লড়াই-এর সূচনার মতোই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে চলে আসা বিশ্বজুড়ে ইউরোপীয় অর্থাৎ পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদের দ্রুত অবক্ষয় ও সেই সূত্রধরে পরিণামে উপনিবেশবাদের অবসান। 'Decolonization' বা অব-উপনিবেশীকরণ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিশ্বরাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। কেননা অব-উপনিবেশীকরণ অর্থাৎ ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অবসানের চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া দেখা গেল বিশেষত এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে জাতীয় মুক্তিআন্দোলন তীব্রতর হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে। বিশ্বব্যাপী প্রসারিত ব্রিটিশ, ফরাসি, স্পেনীয়, ডাচ, ইতালীয় ও পোর্তুগিজ উপনিবেশসমূহ তথা অধীনস্থ দেশগুলিতে যেমন এশিয়ায় ভারত, সিংহল, বার্মা, মালয়, ইন্দোচীন, ফিলিপিনস্, ইন্দোনেশিয়া ; আফ্রিকায় গোল্ডকোস্ট, নাইজেরিয়া, উগান্ডা, মরক্কো, কেনিয়া, আলজিরিয়া প্রভৃতি দেশে দেশে আলোচ্য সময়ে জাতীয়তাবাদের [হবস্‌বমের ভাষায় 'বিপ্লব' (revolution)] দ্রুত প্রসার ঘটেছিল এবং উত্তরোত্তর দুর্বল হয়ে পড়া ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে মুক্তিকামী গণআন্দোলন ক্রমে জোরদার হয়ে উঠেছিল। হবস্‌বম এই প্রবণতাকে অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর নিজের ভাষায়, 'Decolonization and revolution dramatically transformed the political map of the globe'। এই বিষয়ে তাঁর মূল বক্তব্য হল উপরোক্ত অঞ্চলসমূহে উপনিবেশবাদের অবসান ও বিপ্লবের সূত্র ধরে বিশ্বের রাজনৈতিক মানচিত্রে যে বিপুল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল তা সহজেই বোধগম্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে এশিয়া মহাদেশে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের সংখ্যা একলাফে চারগুণ বেড়েছিল। আফ্রিকায় ১৯৩৯ সালে স্বাধীন দেশ ছিল একটি, যুদ্ধ- পরবর্তী বছরগুলিতে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় পঞ্চাশ। এমনকি লাতিন ও মধ্য আমেরিকাতেও ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের পরিসমাপ্তি সদ্যস্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিয়েছিল। অবশ্য হবস্‌বম এই পর্বে স্বাধীন রাষ্ট্রের সংখ্যাবৃদ্ধির চেয়ে

Scanned with CamScanner

জোর দিয়েছেন ঐসব এলাকার জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও তাদের ক্রমবর্ধমান সমবেত চাপসৃষ্টির প্রক্রিয়ার ওপর।[১]

বস্তুত, সাম্রাজ্যবাদের অবসান তথা ঔপনিবেশিক শাসনের পরিসমাপ্তি কোনো নির্দিষ্ট একটি সময়ে এবং কোনো একটিমাত্র কারণে ঘটেনি। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঔপনিবেশিকতার অপসারণ ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিচিত্রধর্মী চরিত্র ধারণ করেছিল। আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ (imperialism) এবং উপনিবেশবাদ (colonialism) যে প্রায় অভিন্ন এবং একই সরলরেখায় অবস্থান করে সে প্রশ্নে কোনো দ্বিমতের অবকাশ থাকে না। এই দুটি ব্যবস্থা বিশ্বের রাজনৈতিক দিগন্তে প্রথম আত্মপ্রসার ঘটিয়েছিল পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন ব্রিটেন, ফ্রান্স, হল্যান্ড, পোর্তুগাল এবং স্পেন-এর মতো ইউরোপীয় শক্তিসমূহ এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার পিছিয়ে পড়া ও দুর্বল দেশগুলিকে পদানত করে নিজ নিজ সাম্রাজ্য বিস্তার করে চলেছিল। এই সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণের অন্তরালে নিহিত ছিল বিশ্ববাণিজ্যকে হাতিয়ার করে উপরোক্ত পশ্চিমি জাতিগুলির বিশ্বশক্তি হয়ে ওঠার অনন্ত কামনা। বলা যেতে পারে যে ব্যক্তিগত পুঁজিবাদ, বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, সংসদীয় গণতন্ত্র এবং প্রচারবহুল রাজনীতির যুগে সেই সাম্রাজ্যবাদী বা সম্প্রসারণবাদী প্রবণতাই ছিল তথাকথিত পশ্চিমি সভ্যতার অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য। এভাবে সাম্রাজ্যবাদ এবং তার অনুসারী হিসেবে উপনিবেশবাদের প্রসারের বৃত্তটি সম্পূর্ণতা পেয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। ১৮৮০ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে উপরোক্ত পুঁজিবাদী শক্তিগুলি (এগুলির সাথে পরবর্তীকালে যুক্ত হয়েছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপান) ইউরোপ এবং আমেরিকা বাদে অবশিষ্ট বিশ্বকে নিজেদের মধ্যে একপ্রকার বণ্টন করে নিয়েছিল। ১৯১৪ সাল নাগাদ পুঁজিবাদের বিশ্ব অর্থনীতি এই গোলার্ধের সর্বত্র প্রসারিত হয়েছিল এবং কমবেশি সবদেশকে প্রভাবিত এমনকি রূপান্তরিত করেছিল। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের পর পুঁজিবাদী অর্থনীতির জয়যাত্রা সদ্য প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমান্তে সাময়িকভাবে থেমে গিয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বিশ্ব রাষ্ট্রনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে সাম্রাজ্যবাদ দেখতে আদতে একটি পিরামিডসদৃশ যার প্রান্তদেশ জুড়ে ছিল ইউরোপ ব্যতীত অন্যান্য মহাদেশের শৃঙ্খলায়িত জনসাধারণ এবং শীর্ষে অবস্থান করছিল মুষ্টিমেয় পশ্চিমি পুঁজিবাদী শক্তি। এই বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের ভাঙন ও অবলুপ্তি রাতারাতি ঘটেনি ; তা ছিল সময়সাপেক্ষ এক জটিল প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি।

অব-উপনিবেশীকরণ (Decolonization) বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার আগে আলাদাভাবে উপনিবেশবাদ বা ঔপনিবেশিকতা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা তুলে ধরা আবশ্যক। খুব সহজসরলভাবে বললে, কোনো শক্তিমান রাষ্ট্রশক্তি যখন তার

Scanned with CamScanner

সামরিক ও অর্থনৈতিক বল প্রয়োগ করে এক বা একাধিক দুর্বল দেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয় সেই পরিস্থিতিকে 'উপনিবেশবাদ' বা 'Colonialism' বলা হয়ে থাকে। মূল লাতিন শব্দ 'colonia' (বিশাল ভূসম্পত্তি বা estate) থেকে ইংরেজি 'Colonialism' শব্দটি উদ্ভূত। একটি শক্তিশালী দেশ যখন অন্য রাষ্ট্রের ওপর আধিপত্য কায়েম করার মধ্য দিয়ে তার সম্পদ ভোগদখল করে এবং স্থানীয় জনসাধারণের ওপর প্রভুত্ব আরোপ করে তখন আধিপত্যবাদী রাষ্ট্র ঔপনিবেশিক শক্তি এবং অধীন দেশটি উপনিবেশ নামে অভিহিত হয়। পণ্ডিতেরা উপনিবেশবাদের একাধিক সংজ্ঞা দিয়েছেন। উইনস্লো[২]-র ভাষায়, 'Occupation of virgin territory in which conflict was incidental, or even unnecessary, and subordinate to the desire of Europeans to find a new place to live'। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে Mercantilism বা বাণিজ্যিক মূলধনবাদের মোড়কে যে ধ্রুপদী সাম্রাজ্যবাদ (Classical Imperialism)-এর সূচনা হয়েছিল তা প্রারম্ভিক পর্যায়ে ঔপনিবেশিকতার বিস্তার ঘটায়। অবশ্য ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের পরিস্থিতিতেই ব্যাপকভাবে উপনিবেশবাদের প্রসার ঘটে এবং সেই সূত্র ধরে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে পুঁজিবাদী শিল্পোন্নত রাষ্ট্রশক্তিগুলি উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার নগ্ন প্রতিযোগিতায় নামে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় মূলত উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় একাধিক ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। সেই ভাঙনের সাথে সাথে সাবেকি বাণিজ্যিকবাদী দর্শন (mercantile philosophy) একরকম বাতিল হয়ে যায় ও তার স্থান দখল করে নেয় এক নতুন ধরনের সাম্রাজ্যবাদ। ১৮৭০ সাল নাগাদ এই পরিবর্তন লক্ষ করা গিয়েছিল। ধ্রুপদী সাম্রাজ্যবাদের তুলনায় এই সময়ের নবকলেবরপ্রাপ্ত সাম্রাজ্যবাদ আধিপত্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্ম দিয়েছিল। কার্যত উনবিংশ শতাব্দীর এই পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির কাছে colony বা উপনিবেশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল জাতীয় শক্তি ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকস্বরূপ। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই স্থূল প্রতিযোগিতার মাঝখানে পড়ে অধিকৃত অঞ্চলগুলির স্থানীয় জনগণ নির্মমভাবে নিপীড়িত ও শোষিত হয়েছিল।

অব-উপনিবেশীকরণের সূচনা (Beginning of Decolonization)

অব-উপনিবেশীকরণ বা উপনিবেশবাদের চূড়ান্ত অবসান ঘটেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ঠিকই, কিন্তু এর সূত্রপাত হয়েছিল তারও আগে, মোটামুটিভাবে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই

Scanned with CamScanner

এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় ইউরোপীয় উপনিবেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম তীব্রতর হয়ে ওঠার সাথে সাথে উপনিবেশবাদের বিদায়ঘণ্টা বাজতে শুরু করেছিল। বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে লক্ষ লক্ষ পরাধীন মানুষের স্বাধীনতা-স্পৃহাকে দারুণভাবে উস্‌কে দিয়েছিল। ভি. কে. মালহোত্রার[৩] কথায়, 'Thus a stage was set for the process of decolonization'। এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী ছিল সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির সীমাহীন লোভ, ঔদ্ধত্য ও স্বার্থপরতা। অধীনস্থ উপনিবেশগুলিতে বিদেশি শাসকশ্রেণি পাশ্চাত্য ভাবনা, শিক্ষাসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে অজান্তে নিজেদের কবর নিজেরাই খুঁড়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, 'Imperialists were their own gravediggers as long with guns, governors and goods flowed to the colonial world Western ideas, including nationalism'।[৪] ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে থাকার একটা পর্যায়ে এশিয়া ও আফ্রিকার অধিবাসীরা একদিকে যেমন ঔপনিবেশিক শোষণ ও তার সাথে নিজেদের দারিদ্র্য সম্পর্কে অবহিত হয়েছিল অপরদিকে তেমনি আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও নিজেদের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণের দাবি জানিয়েছিল। পরাধীন দেশগুলির অ-পুঁজিবাদী ঔপনিবেশিক সমাজের পশ্চিমি শিক্ষায় শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত এলিট শ্রেণির মানুষদের নিয়ে গড়ে ওঠা একটি ক্ষুদ্র অথচ বিক্ষুব্ধ বোদ্ধা সমাজ উপনিবেশবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথম বার্তাবাহক হয়ে উঠেছিল। এই লক্ষ্য ও পরিবর্তিত আর্থ-রাজনীতিক পরিস্থিতি থেকেই দেশে দেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-অভ্যুত্থান এবং গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল।

দুটি বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে বেশ কয়েকটি আফ্রো-এশীয় দেশে স্বাধীনতার সংগ্রাম বা মুক্তিযুদ্ধ তীব্রতর হয়ে উঠেছিল, কিন্তু সেদিন তা সত্ত্বেও আশানুরূপ সাফল্য আসেনি। একমাত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেই অব-উপনিবেশীকরণের প্রক্রিয়া অভূতপূর্ব গতি লাভ করেছিল এবং যার পরিণতিতে এশিয়া ও আফ্রিকার এক বিশাল সংখ্যক দেশ স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। এই ঘটনা দিবালোকের মতো সত্য যে 'After World War II, the threat of worldwide empire building receded and the process of decolonization gained momentum giving birth to a large number of independent states in Asia and Africa'।[৫] এভাবে ১৯৪৬ সালে কার্যত, অব-উপনিবেশীকরণের স্রোতমুখ খুলে গিয়েছিল। এর পরিণতিতে পরবর্তী পঁয়ত্রিশ

Scanned with CamScanner

বছরের মধ্যে অসংখ্য পরাধীন দেশ ও উপনিবেশ ক্রমে ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলমুক্ত সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কেগলে ও উইটকফ[৬]-এর বক্তব্য অনুযায়ী আলোচ্য পর্বের প্রায় সমস্ত জাতি-রাষ্ট্রগুলিই উদ্ভূত হয়েছিল বহুধাবিস্তৃত ব্রিটিশ, ফরাসি, বেলজিয়াম, স্পেনীয় ও পোর্তুগিজ সামুদ্রিক সাম্রাজ্যগুলি ভেঙে যাওয়ার পরিণতিতে। এই অব-উপনিবেশীকরণ প্রসঙ্গে একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরা যেতে পারে। ১৯১৯ সালে যেখানে ভূমণ্ডলের ৭৭.২ শতাংশ ছিল উপনিবেশ এবং জনসংখ্যা ছিল ৬৯.২ শতাংশ, ১৯৭০ সালে সেখানে পৃথিবীতে উপনিবেশ ছিল মাত্র ৪ শতাংশ এবং জনসংখ্যা ছিল বিশ্বের মোট জনসংখ্যার মাত্র ১ এবং ২ শতাংশ।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে 'ডিকলোনাইজেসন' বা অব-উপনিবেশীকরণের প্রক্রিয়ার সমাপ্তি আধুনিক বিশ্বের তথা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে এক নতুন যুগ সূচনা করেছিল। ব্যারাক্লু[৭] যথার্থই মন্তব্য করেছেন, 'with the end of colonialism a new phase of world history had begun'। সমগ্র মানব সভ্যতার ইতিহাসে অব-উপনিবেশীকরণের মতো এত দ্রুততার সাথে কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়নি। পরিণতিতে এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণের অবস্থার পরিবর্তন এবং ইউরোপের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক এক নতুন যুগের অভ্যুদয়ের স্মারকচিহ্ন বহন করেছিল। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তীকালীন পর্বে এই অব-উপনিবেশীকরণের প্রক্রিয়া ছিল সবচেয়ে তাৎপর্যবাহী ও স্মরণীয় ঘটনা।

দ্রুত অব-উপনিবেশীকরণ ও সাম্রাজ্যবাদের অবক্ষয়ের কারণসমূহ (Causes of rapid Decolonization and decline of Imperialism)

যাইহোক, ঔপনিবেশিকতার অবসানের প্রকৃত সূচনা হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই। এই সময়ে এশিয়া ও আফ্রিকার উপনিবেশগুলিতে জাতীয় মুক্তিআন্দোলন বিশেষভাবে বেগবান হতে শুরু করে। একে একে সব উপনিবেশই পরবর্তী দু'দশকের মধ্যে ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে এসে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই প্রবণতাকেই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড ম্যাকমিলান ১৯৬০ সালের জানুয়ারিতে 'Wind of Change' বা 'পরিবর্তনের হাওয়া' বলে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন 'শতাব্দী প্রাচীন পরাধীন দেশের জনগণের মনে আমরা জাতীয় চেতনার জাগরণ লক্ষ্য করেছি...মহাদেশ জুড়ে এই পরিবর্তনের বাতাস বইছে, আমরা তা পছন্দ করি কিংবা

Scanned with CamScanner

সামরিক ও অর্থনৈতিক বল প্রয়োগ করে এক বা একাধিক দুর্বল দেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয় সেই পরিস্থিতিকে 'উপনিবেশবাদ' বা 'Colonialism' বলা হয়ে থাকে। মূল লাতিন শব্দ 'colonia' (বিশাল ভূসম্পত্তি বা estate) থেকে ইংরেজি 'Colonialism' শব্দটি উদ্ভূত। একটি শক্তিশালী দেশ যখন অন্য রাষ্ট্রের ওপর আধিপত্য কায়েম করার মধ্য দিয়ে তার সম্পদ ভোগদখল করে এবং স্থানীয় জনসাধারণের ওপর প্রভুত্ব আরোপ করে তখন আধিপত্যবাদী রাষ্ট্র ঔপনিবেশিক শক্তি এবং অধীন দেশটি উপনিবেশ নামে অভিহিত হয়। পণ্ডিতেরা উপনিবেশবাদের একাধিক সংজ্ঞা দিয়েছেন। উইনস্লো[২]-র ভাষায়, 'Occupation of virgin territory in which conflict was incidental, or even unnecessary, and subordinate to the desire of Europeans to find a new place to live'। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে Mercantilism বা বাণিজ্যিক মূলধনবাদের মোড়কে যে ধ্রুপদী সাম্রাজ্যবাদ (Classical Imperialism)-এর সূচনা হয়েছিল তা প্রারম্ভিক পর্যায়ে ঔপনিবেশিকতার বিস্তার ঘটায়। অবশ্য ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের পরিস্থিতিতেই ব্যাপকভাবে উপনিবেশবাদের প্রসার ঘটে এবং সেই সূত্র ধরে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে পুঁজিবাদী শিল্পোন্নত রাষ্ট্রশক্তিগুলি উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার নগ্ন প্রতিযোগিতায় নামে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় মূলত উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় একাধিক ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। সেই ভাঙনের সাথে সাথে সাবেকি বাণিজ্যিকবাদী দর্শন (mercantile philosophy) একরকম বাতিল হয়ে যায় ও তার স্থান দখল করে নেয় এক নতুন ধরনের সাম্রাজ্যবাদ। ১৮৭০ সাল নাগাদ এই পরিবর্তন লক্ষ করা গিয়েছিল। ধ্রুপদী সাম্রাজ্যবাদের তুলনায় এই সময়ের নবকলেবরপ্রাপ্ত সাম্রাজ্যবাদ আধিপত্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্ম দিয়েছিল। কার্যত, উনবিংশ শতাব্দীর এই পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির কাছে colony বা উপনিবেশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল জাতীয় শক্তি ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকস্বরূপ। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই স্থূল প্রতিযোগিতার মাঝখানে পড়ে অধিকৃত অঞ্চলগুলির স্থানীয় জনগণ নির্মমভাবে নিপীড়িত ও শোষিত হয়েছিল।

অব-উপনিবেশীকরণের সূচনা (Beginning of Decolonization)

অব-উপনিবেশীকরণ বা উপনিবেশবাদের চূড়ান্ত অবসান ঘটেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ঠিকই, কিন্তু এর সূত্রপাত হয়েছিল তারও আগে, মোটামুটিভাবে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই

Scanned with CamScanner

আত্মনির্ধারণের নীতির মূল বক্তব্য ছিল জাতিসমূহের (nationalities) সম্পূর্ণ অধিকার আছে তাদের নিজেদের শাসনকর্তৃত্ব হাতে তুলে নেওয়ার। তাঁরা আরও বলেছেন, 'Self-determination would also mean a redrawing of the map of War-torn Europe so that borders would fit ethnic groupings as closely as possible'।[৮] আত্মনির্ধারণের তত্ত্বের প্রত্যক্ষ প্রভাবে উপনিবেশগুলিতে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং নতুন নতুন জাতি-রাষ্ট্রগুলি (nation-states) আত্মপ্রকাশ করে চলেছিল।

৫. সর্বোপরি, অব-উপনিবেশীকরণের পিছনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভূমিকা ছিল প্রশ্নাতীত। বস্তুত, 'The Second World War proved to be a boon for the freedom of these colonies'।[৯] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে মিত্রশক্তিজোট (Allied Powers) তাদের অধীনে থাকা উপনিবেশগুলির কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে যুদ্ধশেষে উপনিবেশের জনগণ স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসন লাভ করবে। এবং এই কারণেই যুদ্ধাবসানের অব্যবহিত পরেই উপনিবেশবাসীরা ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির কাছে দাবি জানিয়েছিল যুদ্ধকালীন প্রতিশ্রুতি রাখার অর্থাৎ অবিলম্বে গণতন্ত্র এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করতে হবে। অপর একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, যুদ্ধে মিত্রশক্তির জয় হলেও তাদের বিশেষত ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মতো দেশগুলিকে বিপুল পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে নিতে হয়েছিল। এমতাবস্থায়, সবদিক থেকে বিধ্বস্ত পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রশক্তির পক্ষে আর উপনিবেশগুলির বোঝা বহন করা সম্ভব ছিল না। পরিস্থিতি সাপেক্ষে তারা ক্রমে বাধ্য হয়েছিল উপনিবেশগুলিকে স্বশাসনের অধিকার দিতে।

৬. উপনিবেশগুলির মানুষজনের নিত্যসঙ্গী ছিল দুঃখকষ্ট, যন্ত্রণা, শোষণ, দারিদ্র্য, অনাহার, অশিক্ষা, লাঞ্ছনা ও অবমাননা। এইসব দুর্দশা ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় ছিল স্বশাসন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এবং যুদ্ধের পর এই শোষণ ও যন্ত্রণার পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর প্রধান কারণ ছিল ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি, কর্ম সংকোচন, নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব, ত্রুটিপূর্ণ বণ্টন ব্যবস্থা, মূল্যবৃদ্ধি, মূল্য নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনিক ব্যর্থতা, কালোবাজারি, খাদ্যমজুতদারদের সীমাহীন লোভ ও মুনাফা ইত্যাদি। যুদ্ধশেষের প্রতিক্রিয়া হিসেবে সারা বিশ্বে আলাদাভাবে উপনিবেশসমূহে দারিদ্র্য-দুর্দশার পরিমাণ মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে অব-উপনিবেশীকরণের প্রয়োজন জোরালোভাবে অনুভূত হয়।

৭. যুদ্ধোত্তর দুনিয়ায় অন্যতম মহাশক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্থান এবং সাবেকি ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির অবক্ষয় উপনিবেশবাদের অবসানে বিশেষ সহায়ক

Scanned with CamScanner

আত্মনির্ধারণের নীতির মূল বক্তব্য ছিল জাতিসমূহের (nationalities) সম্পূর্ণ অধিকার আছে তাদের নিজেদের শাসনকর্তৃত্ব হাতে তুলে নেওয়ার। তাঁরা আরও বলেছেন, 'Self-determination would also mean a redrawing of the map of War-torn Europe so that borders would fit ethnic groupings as closely as possible'।[৮] আত্মনির্ধারণের তত্ত্বের প্রত্যক্ষ প্রভাবে উপনিবেশগুলিতে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং নতুন নতুন জাতি-রাষ্ট্রগুলি (nation-states) আত্মপ্রকাশ করে চলেছিল।

৫. সর্বোপরি, অব-উপনিবেশীকরণের পিছনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভূমিকা ছিল প্রশ্নাতীত। বস্তুত, 'The Second World War proved to be a boon for the freedom of these colonies'।[৯] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে মিত্রশক্তিজোট (Allied Powers) তাদের অধীনে থাকা উপনিবেশগুলির কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে যুদ্ধশেষে উপনিবেশের জনগণ স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসন লাভ করবে। এবং এই কারণেই যুদ্ধাবসানের অব্যবহিত পরেই উপনিবেশবাসীরা ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির কাছে দাবি জানিয়েছিল যুদ্ধকালীন প্রতিশ্রুতি রাখার অর্থাৎ অবিলম্বে গণতন্ত্র এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করতে হবে। অপর একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, যুদ্ধে মিত্রশক্তির জয় হলেও তাদের বিশেষত ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মতো দেশগুলিকে বিপুল পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে নিতে হয়েছিল। এমতাবস্থায়, সবদিক থেকে বিধ্বস্ত পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রশক্তির পক্ষে আর উপনিবেশগুলির বোঝা বহন করা সম্ভব ছিল না। পরিস্থিতি সাপেক্ষে তারা ক্রমে বাধ্য হয়েছিল উপনিবেশগুলিকে স্বশাসনের অধিকার দিতে।

৬. উপনিবেশগুলির মানুষজনের নিত্যসঙ্গী ছিল দুঃখকষ্ট, যন্ত্রণা, শোষণ, দারিদ্র্য, অনাহার, অশিক্ষা, লাঞ্ছনা ও অবমাননা। এইসব দুর্দশা ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় ছিল স্বশাসন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এবং যুদ্ধের পর এই শোষণ ও যন্ত্রণার পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর প্রধান কারণ ছিল ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি, কর্ম সংকোচন, নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব, ত্রুটিপূর্ণ বণ্টন ব্যবস্থা, মূল্যবৃদ্ধি, মূল্য নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনিক ব্যর্থতা, কালোবাজারি, খাদ্যমজুতদারদের সীমাহীন লোভ ও মুনাফা ইত্যাদি। যুদ্ধশেষের প্রতিক্রিয়া হিসেবে সারা বিশ্বে আলাদাভাবে উপনিবেশসমূহে দারিদ্র্য-দুর্দশার পরিমাণ মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে অব-উপনিবেশীকরণের প্রয়োজন জোরালোভাবে অনুভূত হয়।

৭. যুদ্ধোত্তর দুনিয়ায় অন্যতম মহাশক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্থান এবং সাবেকি ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির অবক্ষয় উপনিবেশবাদের অবসানে বিশেষ সহায়ক

Scanned with CamScanner

হয়েছিল। প্রধানত তিনটি কারণে সুপার পাওয়ার আমেরিকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে পশ্চিমি ঔপনিবেশিক শক্তিগুলিকে ক্রমাগত চাপ দিয়ে চলেছিল তাদের অধীন উপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতা প্রদান করতে : (ক) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চায়নি ব্রিটেন, ফ্রান্স ও স্পেন-এর মতো পশ্চিমি শক্তিগুলি নতুন করে তাদের উপনিবেশগুলির সাহায্য নিয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠুক। (খ) তার দাবি ছিল মিত্রশক্তিসমূহ তাদের যুদ্ধকালীন প্রতিশ্রুতি—আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান এবং বিশ্বজুড়ে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা, যথাযথভাবে পালন করুক। আমেরিকা আশা করেছিল, এর ফলে যে মুক্ত দুনিয়া আত্মপ্রকাশ করবে তা তার ব্যবসা-বাণিজ্যের সহায়ক হবে। (গ) অন্যদিকে, ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির অপসারণে যে শূন্যতা সৃষ্টি হবে আমেরিকা তা পূরণ করার বাসনা পোষণ করত। অনুরূপভাবে মার্কিন রাষ্ট্রশক্তি ভেবেছিল যে দ্বি-মেরু বিশ্বে ক্রমবর্ধমান সোভিয়েত বলয়ের বিপরীতে তার নিজের প্রভাব-বলয় সম্প্রসারিত হবে।

৮. সাম্যবাদের দ্রুত প্রসার ও আলাদাভাবে সমাজতন্ত্রী শক্তি হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের জোরালো উপস্থিতি উপনিবেশবাদের ওপর চরম আঘাত হেনেছিল। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রচণ্ড রকম উপনিবেশবিরোধী ছিল এবং বিশ্বের যে-কোনো প্রান্ত থেকে ঔপনিবেশিকতা মুছে ফেলতে সে সক্রিয় ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে কমিউনিস্টরা উপনিবেশগুলিতে বহুলাংশে জাতীয় আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল এবং সেগুলিকে কমিউনিস্ট আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে সচেষ্ট ছিল। এর ফলে বিশ্বজুড়ে কমিউনিস্ট প্রভাববৃদ্ধির আশঙ্কায় এবং উপনিবেশগুলির সম্ভাব্য সোভিয়েত আগ্রাসন থেকে রক্ষা করতে পশ্চিমি শক্তিগুলিও উপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতাদানের প্রস্তুতি নিতে থাকল এবং দেশে দেশে অ-কমিউনিস্ট জনগণ ও রাজনৈতিক দলগুলির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করল। মনে রাখা প্রয়োজন যে আধুনিক সাম্যবাদের জনক মার্কস ও তাঁর অনুগামীরা তাঁদের রচনায় উপনিবেশবাদের স্বরূপ ও জনগণের ওপর চলা ঔপনিবেশিক শোষণ ও অপশাসন নিয়ে বিশদ আলোচনা করে গেছেন। আসলে, ঔপনিবেশিকতার দিন ফুরিয়ে এসেছিল।

৯. প্রধানত ভারতের নেতৃত্বে সংগঠিত নির্জোট আন্দোলন (NAM) দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিজোট থেকে সমদূরত্বে থাকা তৃতীয় বিশ্ব অর্থাৎ আফ্রো-এশীয় দুনিয়া থেকে উপনিবেশবাদের অবসানে বিশেষ সাহায্য করেছিল। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতৃত্ব উপনিবেশবাদ-বিরোধী সংগ্রামে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেন ও এই স্বাধীনতার লড়াইয়ে তাদের পাশে সতত থাকার প্রতিশ্রুতি দেন।

১০. রাষ্ট্রসংঘের গঠন ও তার কর্মসূচি উপনিবেশগুলির বিলুপ্তিতে বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল। রাষ্ট্রসংঘের মহাসনদের (UN Charter) নানা অনুচ্ছেদে উপনিবেশগুলিকে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের কথা বলা হয়েছে এবং রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাবিত 'নতুন বিশ্ব' ছিল এক

Scanned with CamScanner

এক বিশ্ব যেখানে প্রতিটি জাতি ও রাষ্ট্র সমান মর্যাদা ও অধিকার অর্জন করবে। এর প্রয়োজনেই উপনিবেশবাদের অবসান জরুরি ছিল। যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে এশিয়া ও আফ্রিকার একের পর এক উপনিবেশ স্বাধীনতা অর্জন করে এবং দীর্ঘদিনের সাম্রাজ্যিক শাসনের অবসানের পর সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে যোগদান করে। পূর্বতন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিও রাষ্ট্রসংঘের ডাকে সাড়া দিয়ে ধীরে ধীরে উপনিবেশগুলিকে তাদের শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তি দিয়েছিল। অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে জাগ্রত জনমতের চাপের কাছে নতিস্বীকার করে ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহ উপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতা প্রদান করতে একরকম বাধ্য হয়েছিল। এসবের পরিণতিতে আত্মপ্রকাশ করেছিল একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র।

বিশিষ্ট ওলন্দাজ পণ্ডিত এইচ. এল. ওয়েসলিং (H. L. Wesseling) একদা ইউরোপীয় সাম্রাজ্যসমূহের অব-উপনিবেশীকরণ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন, 'Decolonisation has finished. It definitely belongs to the past. Yet somehow it has refused to become history.'

Scanned with CamScanner